আগষ্ট ২০২৬ ।। পঞ্চম সংখ্যা

...ও কেলেঘাই

জীবন, জীবিকা ও সাহিত্য



...ও কেলেঘাই
জীবন-জীবিকা ও সাহিত্য

www.keleghai.in
পটাশপুর

পঞ্চম সংখ্যা, আগষ্ট-২০২৬ Volume-V, Issue-1(2026)

একটি ওয়েব জার্নাল। কেলেঘাই একটি নদীর নাম। যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান। এই জার্নালের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে-

প্রথমতঃ তীরবর্তী সমাজের জীবন জীবিকায় কেলেঘাই নদী কতখানি অপরিহার্য ছিল এবং আছে তার মৌলিক অন্বেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বিচিত্র শাখা প্রশাখার কল্পলোকে কেলেঘাই নদীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

উপদেষ্টা ঃ মনোতোষ আচার্য

সম্পাদক ঃ ড. মৃন্ময় মণ্ডল

'...ও কেলেঘাই'র পক্ষে ড. মৃন্ময় মণ্ডল কর্তৃক
পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৪৫৪ থেকে প্রকাশিত

মুদ্রণঃ-ফিরহিম এন্টারপ্রাইজ, বেলদা,**ফোন- ৯৪৭৫২৫৩৮৯৫**

সম্পাদকীয় দপ্তর এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
'...ও কেলেঘাই' পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৪
ওয়েবসাইট- www.keleghai.in
ই-মেল-o.keleghai@gmail.com
মোবাইল-৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

মূল্য ঃ ২১ টাকা

এই সংখ্যায় যাঁরা কলম ধরলেন

তারাপদ পণ্ডা, মনোতোষ আচার্য, সুপ্রিয় দাস, বিশ্বসিন্ধু দে,
সন্দীপন বেরা, মধুরিমা, বিষ্ণুপদ আচার্য,
ড. মৃণ্ময় মণ্ডল, বিষ্ণুপদ দাশ,

অল্পকথায়

কেলেঘাই একটি ছোটো নদী। এই নদী শুধু আমার নয়, আপনারও। নদী যেমন জীবনকে বয়ে নিয়ে চলে, তেমনি নীরবে মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে থাকে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই নদীকে মায়ের মতো সম্মান করা হয়। মানুষের সভ্যতা ও নদীর সম্পর্ক খুব গভীর। এই সম্পর্ক ভালোবাসা, নির্ভরতা ও আবেগে ভরা।

নদীকে ঘিরেই বহু জনপদের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। নদীর ধারায় যেমন মানুষের আনন্দের গল্প আছে, তেমন রয়েছে দুঃখ ও হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতিও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক নদীর মতো আমাদের কেলেঘাইও তার আগের মাতৃত্ব ও সৌন্দর্য হারিয়েছে। সেই হারানো দিনের স্মৃতি ও কেলেঘাই নদীকে ঘিরে মানুষের জীবনযাত্রার কথা তুলে ধরতেই "…..ও কেলঘাই" পত্রিকার পথচলা।

এই পত্রিকা শুধু সাহিত্যচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কেলেঘাই নদী ও নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা মানুষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাকে সবার সামনে তুলে ধরাই এর মূল উদ্দেশ্য। তাই "…ও কেলেঘাই" খুঁজে বেড়ায় এমন সব মানুষের লেখা, যাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেলেঘাই এক জীবন্ত নদী হিসেবে নতুনভাবে পরিচিত হবে।

…ও কেলেঘাইর পাঠক বর্গের কাছে ক্ষমা চাইছি কারণ এই বছর সঠিক সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে ওঠেনি। পত্রিকার শুরু থেকেই লেখালেখির গুরুত্ব বাড়লেও কমছে এই নদী কেন্দ্রিক লেখকের। যেহেতু পত্রিকার বিষয়বস্তু কেবলই কেলেঘাই নদী, তাই লেখা পেতে অপেক্ষা করতে হয়। যাইহোক সেই অপেক্ষা থেমে থাকেনি থাকবেও না। …ও কেলেঘাই একদিন এই অভাব পরিপূর্ণ করে সাহিত্যে, গবেষণায়, পরিবেশ সচেতনতায় অবদান রাখবে, এই কামনা করতেই পারি। অন্য দিকে পাঠকদের উৎসাহ এবং সাহিত্য, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের আগ্রহ প্রমাণ করে যে "…ও কেলেঘাই" আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হয়ে উঠেছে। পঞ্চম সংখ্যায় যারা লিখেছেন, তাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আগাম শারদিয়ার অভিনন্দন। উপদেষ্টা ও পর্যালোচকদের মূল্যবান মতামত ভবিষ্যত পত্রিকাটিকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশা রাখি।

লেখায় কোনো ভুল বা ত্রুটি থাকলে পাঠকরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের গঠনমূলক মতামত আগামী সংখ্যাকে আরও ভালো করতে আমাদের উৎসাহ জোগাবে।

আগষ্ট -২০২৬

ড. মৃণ্ময় মন্ডল
সম্পাদক

কেমন আছো কেলেঘাই ?

তারাপদ পন্ডা
(খাকুড়দা, পশ্চিম মেদিনীপুর)

--- কেমন আছো কেলেঘাই ?
--- তুমি এসেছো ? কতদিন পর সময় হলো! এতদিন পর আমার কথা মনে পড়লো ?
---আমি তো শহর থেকে বাড়ি এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসি। তোমাকে আরও জানতে চাই।
--- কি প্রয়োজন আমাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করার ? আমি তো বেশ আছি।
--- কিন্তু তোমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে তুমি ভালো নেই। মনের কোথাও ক্ষোভ লুকিয়ে আছে।
--- জানো যদি জিজ্ঞেস কেন করছো ? ভবঘুরের মতো কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও। ন'মাসে ছ'মাসে উদয় হও। তুমি কি পারবে আমার দুর্দশা ঘোচাতে ?
--- সেবার বর্ষার সময় এসেছিলাম। তোমার কি প্রলয়ঙ্করী রূপ! ভয়ঙ্করী, দয়ামায়াহীণা, নিষ্ঠুর মহিলার মতো।
---বোকা কোথাকার! আমাকে চেনার মতো তোমাদের মনের তল কোথায় ! তোমরা জানো না আমি তো তোমাদের মায়ের আর এক রূপ। আমার শীতল জলধারায় তোমাদের সঙ্গে বাকি সব প্রজাতিকে সুশৃঙ্খলে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।
--- তুমি কি বলতে চাও যত দোষ আমাদের ?
--- একটু রোসো বাপু। আমার পূবপাড়ের ঐ বটগাছের তলায় দু'দন্ড বোসো। মায়ের দুধের মতো পবিত্র আমার শীতল জল আমি খাওয়াতে পারবো না। তোমাদের কাছে আমি অপেয়, বিষাক্ত।
--- এখন আর নদীর জল কে বা খায় ? আমরা এখন অনেক এগিয়ে এসেছি। এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই।
--- দাঁড়াও বাপু। নিঃস্বাস নিতে দাও। আমি অসুস্থ। ক্ষয়রোগে ভুগছি। হাঁপিয়ে উঠি। আমার অবস্থা অনেকটা তোমাদের বাড়ির মায়েদের মতো।তোমরা বড় হয়ে গেছো, মা কেমন আছেন তা জানার মতো সময় কোথায় ?
শহরে থাকাকালীন বৌ'কে প্রতিদিন ফোন করার সময় মাকে ফোন করো ? হয়তো বৌ'র কাছে জেনে নাও। আমার অবস্থাও তেমন।
আমাকে বাঁচানোর জন্য, সংস্কারের জন্য অনেক মাস্টার প্লান করেন আমার বৌমারা। জল পড়ে, ফাইল নড়ে কিন্তু জল সরে না। উল্টে তোমরা আমাকে সর্বনাশী, নিষ্ঠুর বলে গালি দাও।
--- আমি তোমার ভালো চাই, তোমাকে ভালোবাসি।
--- শুকনো ভালোবাসায় কি লাভ বলো তো ! আমরা বা তোমার মায়েদের ? আমার

মতো তাঁরাও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দুয়ারের এককোনে পড়ে আছেন। পেচ্ছাব, পায়খানার উপর।
আমাদের সত্যি যদি কল্যাণ করতে চাও তাহলে রুখে দাঁড়াতে হবে, গর্জে উঠতে হবে সংসারের বিরুদ্ধে।
--- আমার মা নাহয় পেচ্ছাব পায়খানার উপর পড়ে আছেন, কিন্তু তুমি কোথায় পেচ্ছাব পায়খানার উপর পড়ে আছো ?
--- অবোধ ছেলে আমার ! আমার দুই পাড়ে কত শত কলকারখানা, ইটভাটা গড়ে উঠেছে দ্যাখো নি ? তাদের রাসায়নিক মিশ্রিত পরিত্যক্ত বিষাক্ত জল পেচ্ছাবের চেয়ে অনেক দুর্গন্ধময় ও ক্ষতিকারক। তাদের তৈরী বর্জ্য পদার্থ পায়খানার চেয়ে কোনো অংশে কম দুষণ ছড়ায় না।
-- তোমার বুকের মধ্যে এতো ছাইচাপা কষ্ট লুকিয়ে আছে জানতাম না তো!
--- আমার কষ্টের কতা তোমাকে বলেছি কোথায় ? কষ্টের কতা শুনতে হলে রাত পুইয়ে যাবে। তোমার ধয্যি থাকবে না।
---না না, আজ শুনবো তোমার মনের কথা। তুমি শোনাও।
--- তাহলে তোমার ব্যাগে রাখা জলের বোতল থেকে জল খাও। তোমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।
--- আশ্চর্য্য, তুমি জানলে কি করে আমার গলা শুকিয়ে গেছে।
--- মায়ের মন তো। মায়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়।
--- ঠিক আছে। জল খেলাম। এবার শোনাও, আজ তোমার সব কথা শুনবো।
--- আমাকেও একটু থিতু হতে দাও বাপু। কেমন করে শুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না। খেই হারিয়ে ফেলেছি। অকাল বার্ধক্যে ভুগছি। নানান অসুখ আমাকে গ্রাস করেছে। বর্ষাকালে তিনমাসস আমি পূর্ন যৌবনবতী থাকি। এত বৃষ্টিকে ধারণ করার মতন আমার ক্ষমতা নেই। ভারসাম্য ধবংস হয়েছে তোমাদের জন্য। সে কথায় পরে আসছি। তুমি উতলা হয়ো না। গুছিয়ে বলতে দাও।
বাধ্য হয়ে আমার দুই পাড় ভেঙে পাশাপাশি জনবসতিতে, নীচুজলাভূমিগুলোতে ঢুকে জায়গা বানাতে হয়।
সেই সময় সুশীল সমাজের ঘুম ভাঙে। বোকার মতো পাড় বাঁধতে শুরু করে।
যে কাজ বর্ষাকালের পরিস্থিতি দেখে শিখতে হয়, শুরু করতে হয়, নিদেনপক্ষে গ্রীষ্মের সময়।

জনদরদী নেতারা বর্ষাতি পরে ভিজেনেয়ে একসা হয়ে, কন্ট্রোলরুম বানিয়ে রাত জেগে, লোকদেখানো মাস্টার প্লান অনুশীলন করে আমার উদ্দাম গতিকে রোধ করার বৃথা চেষ্টা করে।
আমি রেগে গিয়ে আরও প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করি। ইচ্ছে হয় সবকিছু ভাসিয়ে দিতে, মুছে দিতে।

আবার সাধারণ মানুষরা যখন সহায়সম্বলহীণ হয়ে গবাদিপশুদের নিয়ে আমার পাড়ে ত্রিপলের তলায় আশ্রয় নেয়, আমি তখন অঝোরধারায় কাঁদি। তোমরা দেখতে পাও না। আমার ভয়ঙ্করীরূপটা শুধু দেখতে পাও।

তোমরা আমাকে কত গালি দাও, কালনাগিনী, সর্বনাশী আরও কত কি !

কাগজওয়ালারা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমার দুর্নাম লেখে। আমার কুৎসা তোমরা কবি লেখকরা লেখালেখি করো।

বৃষ্টির পর আমি নির্বিষ হয়ে পড়ি। তারপর শুরু হয় তোমাদের ধবংসলীলা। যেন প্রতিশোধের পালা শুরু হয়।

জায়গায় জায়গায় বাঁধ দিয়ে আমার অস্তিত্ব মুছিয়ে দিতে চাও।

আমার মুলস্রোতে মাটি ভরিয়ে সরকারি জমিতে পরিণত করো।

আমার স্তন শুকিয়ে যায়। ইচ্ছা থাকলেও আমার সন্তানের মতো মানবজাতিসহ নানান প্রজাতির প্রানীদের অমৃততুল্য জল পান করাতে পারি না।

অর্ধশিক্ষিত, স্বার্থপর মানুষেরা আমার সারাশরীর জুড়ে কত শত ডিপ-টিউবওয়েল পুঁতে দেয়। যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠি।

এতো লোভ তোমাদের! এতোটা আত্মঘাতী! কষ্টের মধ্যেও হাসি পায়।

--- এতটা গভীরে আমি ভাবিনি।

--- আমাকে বলতে দাও বাপু। আমার সব দুঃখ উজাড় করে বলতে চাই।

হ্যাঁ, যে কতা বলতে চেয়েছিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। যেমন ভোঁদড়, কটাস, গন্ধগোকুল, উল্লুক, বাদুড়, নানা প্রযাতির সাপ, ব্যাঙ, ঝিনুক, শামুক, গুগলি।

কয়েক ধরনের মাছের নাম বলবো। যেগুলো তুমি চেনো না, তোমার বাপ-ঠাকুরদা নিশ্চয় চিনতে পারবেন। যেমন বাটিয়াপুইয়া, লইট্যা ট্যাংরা, কুর্শা, বাঘাইর, মহাশোল, পিপলা শোল, নালিন্দা, কালো পাবদা, ভাঙনবাটা, পাঙ্গাস, খরকি, চেনুয়া, চান্দা, বাক্কামাছ ও আরও কত কি।

বৈশাখ জষ্টি মাসে মাছেরা প্রজননক্ষম হয়। আমার দুই পাড়ে গড়ে ওঠা সারিসারি কারখানা থেকে একনাগাড়ে রাসায়নিক, বিষাক্ত পরিত্যক্ত জলের প্রভাবে মাছগুলো নির্বীজ হয়ে পড়ে। অকালে মারা যায়।

তারপর মানুষের লোভের শেষ নেই। চাহিদার শেষ নেই। মাছধরা বা সংরক্ষণের কোনো নিয়ম নেই। আইন থাকলেও জেলেরা বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

ফলে বাস্তুতন্ত্র ধীরে ধীরে ধবংস হচ্ছে। তোমরা শিক্ষিত মানুষ, আরও ভালো বুঝবে।

আমার আর এক শত্রু হলো কচুরিপানা। রক্তবীজের বংশ ওরা। তারা শপথ নিয়েছে আমার সত্ত্বা নির্লোপ করে শান্তি পাবে।

তোমরা পারো না, কচুরিপানার শিকল থেকে মুক্ত করে আমার অবশিষ্ট অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে ?

--- এতক্ষন তোমার উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। বাকরুদ্ধ। লজ্জিত। চোখের জল আটকাতে পারছি না। আবেগতাড়িত হয়ে পড়লাম।

--- দুঃখ করিস না বেটা। সন্তানের চোখের জল কোনো মায়ের কাঙ্খিত নয়। তারচে আমার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোন। আমাকে নিয়ে তোরা একটা কমিটি বানা। ---' কেলেঘাই বাচাঁও কমিটি' নামে। তোর মতো পরিবেশ সচেতন দামাল ছেলেদের কমিটিতে নিবি।

তারপর আমার উৎসস্থল বামনীগ্রাম থেকে সংস্কারের পরিকল্পনা নে। উৎসমুখ আরও প্রসারিত করবি। তারপর কেশিয়াড়ি, মেট্যাল যমুনা, পোক্তাপোল, গোপালপুর, আমগাছিয়া হয়ে ঢেউভাঙা পর্যন্ত্য ঠিকমতো ঢাল দিযে চওড়া করে খননের ব্যবস্থা করবি।

পাড়ের উপর গড়ে ওঠা কলকারখানা, ইটভাটা ও ব্যাঙের ছাতার মতো জনবসতি উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করবি।

আমার দুইপাড়ে শোভা পাবে নিবিড় বনসৃজন প্রকল্প। বিশেষ বিশেষ জায়গায় মন্দির নির্মানের অনুমতি দিলাম।

নদীপাড়ের গাছ থেকে শুরু করে সমুহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণের জন্য কঠোর থেকে কঠোরতম দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদানের আইন করতে হবে। দেখবি কয়েকবছরের আমি আমার পুরোনো ঐতিহ্য ও মর্যাদা ফিরে পাবো। ধীরে ধীরে ফিরে আসবে আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু প্রজাতিরা, মৎস্যকুল এমন কি সাপ, ব্যাঙ, শামুক-ঝিনুক ও গুগলিরা।

তোরা ফিরে পাবি শান্তির জীবন। আমি ধন্য হবো তোদের জল পান করিয়ে। মায়েরা যেমন সন্তানকে স্তন্যপান করিয়ে আশ্বস্ত হন।

কি রে পারবি না ? কথা দে।

--- আমি কথা দিলাম। শপথ নিলাম। আজ থেকে আমার ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমি ফিরিয়ে দেবো তোমার হারিয়ে যাওয়া সম্মান।

তুমি কেঁদো না মা।

--- আমি কাঁদছি না রে। এ আমার আনন্দাশ্রু। মুক্তোর মতো থরে থরে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু বাবা, আমার আর একটা কথা রাখবি ?

--- কি, বলো না ?

--- আজ থেকে আমার মতো তোর মায়েরও যত্ন নিবি। অনেক কষ্টে তোদের মানুষ করেছে.....

--- তুমি কি আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়বে ? আমার জন্মদাত্রিণীর জন্য মন কাঁদছে। কতদিন মন খুলে কথা বলতে পারি নি!

এবার আমায় যেতে দাও.....

ডেকে উঠি পাখিদের স্বরে

মনোতোষ আচার্য
এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

বহুবার এখানে এসেছি
কতবার পথ ভুলে
কাদা পা নদীতে ধুয়ে এখানে এসেছি

বানমোছা ঘরগুলি পরে আছে কুটোর পোশাক
সবেদা গাছের গাঢ় সবুজ মাখা টোটাবাড়ি, জারুলের ডাঙা

আদিগন্ত আমার উঠোন জুড়ে গাছে গাছে তোমার আঁচল

হাতের আখর-কথা আছে ঝুলে দেয়াল শরীরে
নাম ধরে ডেকে উঠি পাখিদের স্বরে
স্মৃতির গহীন ছায়া ভেসে যায় কেলেঘাই জলে।

তুমিই কেলেঘাই

সুপ্রিয় দাস
পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

জন্ম তোমার ঝাড়গ্রামের
কলসিভাঙ্গা গ্রামে;
কাঁসাইতে মিশে পরিচয় তোমার
হলদি নদী নামে।
কপালেশ্বরী ভগিনী ঠিক
তোমার পাশেই থাকে
পুষ্ট হৃদয় করতে তোমার-
সদা চেষ্টা করে।
১২১ কিমি দীর্ঘ তুমি
দীর্ঘ তোমার আঁচল;
বর্ষায় তুমি সদা যুবতী
চাষবাসস কর সচল।
নীলাচলে মহাপ্রভুর-
ছোঁয়া তোমার বক্ষে,

ধন্য নদী, ধন্য তুমি
মোদের করেছ রক্ষে।
তোমার অবদান ভুলতে বসেছে
হতভাগা সব মানুষ,
তোমায় নিয়ে নেই চিন্তা
শুধুই ওড়ায় ফানুস।
তাই বলে অভিমান
করো না ওগো নদী,
তোমায় নিয়ে ভাবার মতো
সময় এসেছে আজই।
তোমার কারনে আজও হাড়ি চড়ে
কত মানুষের ঘরে,
কত মানুষের জীবিকা চলে
তুমি আছো বলে।
তোমায় নিযে সকলে মোরা
গর্ববোধ করি,
সমোচ্চস্বরে বলতে চাই
তুমিই কেলেঘাই
তুমিই মোদের নদী।

বেঁচে থাকো তুমি কেলেঘাই

বিশ্বসিন্ধু দে
বেলদা, পাশ্চিম মেদিনীপুর

তুমি বয়ে চলো দুঃখ বুকে
মোহনার দিকে নদী।
বুঝতে পারে কি সেই সব লোক
বুকের ব্যথাটা যদি।

তুমি কেলেঘাই কেউ কেউ বলে
কালিয়াঘাইও তুমি
কেশিয়াড়ি আর নারায়ণগড়ের
মাটিকে গিয়েছ চুমি।
ঝাড়গ্রামে শুরু শেষ যে সবং-
এ তোমার যে বয়ে চলা
কোথাও মরা, কোথাও যে প্রাণ
টিমটিম করে ধরা।

কংসাবতীতে মিশে গেছ তুমি
তোমার গর্ভে কত কি-
তোমার পাড়েতে কত প্রাণ বাঁচে
অর্বাচীনেরা জানে কি!

তোমাকে নিয়ে কত কি কাহিনী
কিংবদন্তি হয়েছে
পোক্তাপোলের লহরা সেতুর
ইতিহাস কি গো ভেঙেছে।

মল্লিকা আছে, সাথে গল্পটা
বৈশাখী মেলা, পূজাতে
কৃষক বাঁচছে এবং মরছে
তোমার করুণা, রোষেতে।

তুমি ভালো নেই, গভীরতা কই
তোমার গর্ভে যন্ত্র
তোমাকে শুষছে যন্ত্র জীবন
গতিকে করছে রুদ্ধ।

তুলসি চারার মেলাতে তোমার
ইতিহাসে বেশ জাঁক
কিন্তু দূষণে প্রতিবারে দেখি
প্রাণ করে হাঁসফাঁস।

তবু বয়ে চলো কষ্ট বুকেতে
অভিযোগ নাই কিছুতে
কেলেঘাই তুমি যাও বয়ে যাও
কান্না-হাসি ও দুখেতে।

ও কেলেঘাই

সন্দীপন বেরা

(বেলদা, পাশ্চিম মেদিনীপুর)

ও কেলেঘাই
একদিন শান্ত শ্বাসের মতো ধানের ক্ষেতে
নরম রোদ্দুরের আলপনা এঁকে
গ্রামের উঠোনে বয়ে আনতে ভোরের জলরঙ।
বিপর্যস্ত তোমার বুকে কাদা, ক্ষত, কোলাহল।

যদিও বর্ষার কালো চাদরে ঢেকে যায় তোমার স্বর,
ঘরভাঙা নদীকেন্দ্রীক মানুষের দীর্ঘশ্বাস
তোমার ঢেউয়ের সাথে মিশে যায় নোনতা আর্তনাদে।
আসলে সেসব মানুষের অমানবিকতার ফল।

ও কেলেঘাই...
একদিন শিশুরা তোমার ঘাটে কেমন হেসে উঠত ?
কাঠের নৌকা কেমন ভেসে যেত স্বপ্নের মতো ?
আজ সেই ঘাটে শেকড়হারা বৃক্ষ,
ভাঙা বাঁধের গ্লানি আর ভয়।
তবু তোমার চোখে আমি দেখি
অদম্য বেঁচে থাকার জেদ।
তোমার চরে ঘুরে বেড়ানো বাস্তুতন্ত্র রক্ষাকারী
বিলুপ্তপ্রায় প্রনীরা আরও বিলুপ্তির পথে
পলির স্তূপে তুমি লিখে রাখো ইতিহাস,
ভাঙনের ভেতরেও জেগে ওঠে সৃষ্টির বীজ।

ও কেলেঘাই,
তোমার বিপর্যয় শুধু ক্রোধ নয়
এ এক সতর্কবার্তা,
মানুষের লোভ আর অবহেলার বিরুদ্ধে তোমার গর্জন।
একদিন আবার তুমি শান্ত হবে
ধানের শিষে ঝিলমিল করবে তোমার প্রতিচ্ছবি,
আর আমরা শিখব, নদীকে ভালোবাসতে হলে
নদীর মতোই হতে হয় সহিষ্ণু ও প্রবহমান।।

কেলেঘাইর ভাষা

মধুরিমা

(মাহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর। সায়েন্স জানালিস্ট)

নদী যখন বয়ে চলে, তার উপরে নির্ভর করে গড়ে ওঠে তার চারিদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, পালা-পার্বন। এমনকি ভাষা। নদী হারানোর কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু নদী হারানোর পাশাপাশি ভাষা হারানোর কথা ? তা বোধহয় চট করে শোনা যায় না। মেদিনীপুরে কেলেঘাই নদী সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দা ড. মৃন্ময় মন্ডল মহাশয় একদিন বললেন, তাঁর চিরকালীন দেখে আসা শৈশবের কেলেঘাই নদী আর আগের মতন নেই । এককালে বঙ্গ ও কলিঙ্গের মাঝে যোগাযোগের সেতু বন্ধনের কাজে যে নদী করেছিল, সেই কেলেঘাই আজ মৃতপ্রায়। নদী হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে নদী এবং নদীকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক শব্দ। সেগুলো বাংলা হলেও, তাদের ব্যপ্তী মেদিনীপুর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। উপভাষার বৈশিষ্ট এটিই। যেমন ধরা যাক মঙ শব্দটি। উক্ত অঞ্চলে মঙ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নৌকার অগ্রভাগ বোঝাতে। মেলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যাত শব্দটি। অথচ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে, এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও মেলা বোঝাতে যাত শব্দটির ব্যবহার রয়েছে, এমনটি এযাবৎ শোনা যায় নি। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কলিঙ্গ যাত্রা করেছিলেন এই পথে। সেই ইতিহাস স্মরণে রেখে, কেলেঘাই নদীর ধারে প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে পালিত হয় তুলসি চারার মেলা।

একটি নদী কেবল একটি অঞ্চল বা ভূপ্রকৃতির উপর বয়ে চলে না। সেই অঞ্চলের মানুষের অন্তরের ভূপ্রকৃতি দিয়ে বয়ে চলে সে। তার হারিয়ে যাবার হিসেব চট করে কেউ রাখে না। কিন্তু একদিন হটাৎ মানুষগুলোর মনে হয়, কী যেন হারিয়ে গেছে তাদের জীবন থেকে। অথচ আপাত ভাবে সবই ঠিক আছে। সে তখন তাকায় নিজের অন্তরে। দেখে শেশবের সেই নদীটা কখন জানি হারিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে দীর্ঘ পরিচিত কিছু শব্দ।

সংকট

বিষ্ণুপদ আচার্য

দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর

৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ভোর চারটা। রাতের ভ্যাপসা গরম কাটিয়ে ভোরের দিকে অচেতন ঘুমে অসীম বাবু। হটাৎ একটি দরজার ধাক্কার শব্দে ধড়পড় করে বিছানায় উঠে বসেন। কে যেন অসীম বাবুর নাম ধরে ডাকছে --স্যার, ম্যাডামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, গাড়ি ধাক্কা

দিয়ে বেরিয়ে গেছে। নিমেষে অসীম বাবুর মনে আসে ভোরে মর্নিং ওয়াক করা অতসীর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তাতেই কি এই বিপত্তি! কোনরকম সামলে নিয়ে দৌড় লাগালেন অকুস্থলে। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে মোরামের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে অতসী। মাথা ফেটে চৌচির। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। কোনরকম পাঁজা কোলা করে তুলে ধরার চেষ্টা করেন অসীম বাবু। না, পারেন না। দূরে আবছা আলোয় দেখতে পান মঙ্গলকে, কোথায় যেন কাজ করতে চলেছে, সাত সকালে। হাত তুলে ইঙ্গিতে তাঁর দিকে আসতে বলেন। নিমেষে মঙ্গল ও অসীম বাবু একটি পথ চলতি টোটোয় করে নিয়ে অতসীকে ভর্তি করেন হাসপাতালে। গ্রামীণ হাসপাতালের কর্মরত ডাক্তার তাঁর চেনা। তিনি প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ব্যান্ডেজ দিয়ে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে অতসীকে রেফার করেন শহরের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অ্যাম্বুলেন্সের মুসলিম ড্রাইভার হীরা, নিমেষে চিনতে পারেন অসীম বাবুকে। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ থাকাকালীন তার গাড়ি চালাতেন এই হীরা। ডাকাবুকো চেহেরার হীরা প্রায় সারাদনিই অসীম বাবুর কাছে থেকে তাকে সাহায্য করলেন।

হাসপাতাল বেডে শুয়ে যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকেন অতসী। গাড়ির আঘাতে বুকের পাঁজরের গভীর একটি বড় চিড় ধরে। ডাক্তারবাবু ট্রাকসান দিয়ে কোনরকম শুইয়ে রাখেন অতসীকে। অতসীর যন্ত্রনায় অসীমবাবুর চোখে জল ঝরতে থাকে। বড় ছেলে অর্ক সহজ ও সরল। সে তার বাবার কাছে কাছে থাকে। তার অব্যক্ত যন্ত্রনা, জলভরা চোখের চাউনি অসীম বাবুকে কুরে কুরে খায়।

হাসপাতালের অদূরে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীনকায়া গ্রাম্য নদী-কেলেঘাই। তার গাম্ভীর্যহীন ঢেউ গুলি তীরে এসে বাঁধানো ঘাটের পাথরগুলিকে যেন চুমু খেয়ে যায় প্রতিদিন। অনেকদিন পর অসীম বাবু বিষন্ন বিকালের এই পড়ন্ত বেলায় গোধূলি লগ্নে তার পাড়ে এসে বসলেন, প্রকৃতির কোলে নিজের ভারাক্রান্ত মনকে উজাড় করে দেওয়ার জন্য। মনের মধ্যে ভিড় করে এলো অনেক আলো-ছায়া ছবি-ছাত্র রাজনীতি-জনসেবা --শিক্ষকতা--সমাজসেবা--অনেক,অনেক কিছু। রাজনীতির উচ্চশিখরে থাকাকালীন বহু মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করা, অথর্ব বিকলাঙ্গ ব্যক্তির ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করা, করোনা চলাকালীন ও তৎপরবর্তী সময়ে মানুষের কাছে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বিপ্লবী স্মরণে ট্রাস্ট গঠন করা, ঔষধপত্র, রক্তের ব্যবস্থা, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বইখাতার ব্যবস্থা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরই অত্যন্ত তীব্র যন্ত্রনার মুহূর্তে তার প্রিয়জনের মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও তাঁর অন্তরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে।

গ্রাম বাংলার বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথে বয়ে চলা নদীর কুলু কুলু ধ্বনি তাঁকে যেন পৌঁছে দেয় কোন এক অনন্ত লোকে, যেখানে কোন বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই, পরশ্রীকাতরতা নেই, কেবল শন্তি, শান্তি আর শান্তি।

এই শান্তির অনন্ত সুখে নিজেকে নিমজ্জিত করার লক্ষ্যে কেলেঘাইয়ের শান্ত সমাহিত বুকে আশ্রয় খুঁজে পান অসীম বাবু।

তুলসী চারার মেলার ইতিহাস ও ইতিকথা

ড. মৃন্ময় মন্ডল
পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির মধ্যরাত থেকে পরের দিন ভোরবেলা পর্যন্ত এই মঞ্চের উভয় পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে ডুব দিয়ে যে ব্যক্তি তিন মুঠো মাটি তুলে এই যোগ মঞ্চে দেবে তাঁর মনস্কামনা পূর্ন হবে। মৃত্যুর সময় শিষ্যকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন বাকসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক গোকুলানান্দ বাবাজী।

আপনারা নিশ্চয় এতখনে বুঝতে পেরেছেন আমি কোন মেলার কথা বলছি হা তুলসী চারার মেলা-এই পুন্যস্থানের সঙ্গে কেলেঘাই নদীর উপকন্ঠে প্রায় ৫০০ শত বছর আগে থেকে কয়েক লক্ষ মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এবার সেই ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ আপনাদের কাছে তুলে ধরবো।

গোকুলানন্দ বাবাজীর সমাধি ক্ষেত্র থেকেই শুরু হয়েছিল তুলসিচারার মেলা বা ভুঞার যাত বা গকুলানন্দজির মেলা। তাই কে ছিলেন এই বাকসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক, কি তাঁর পরিচয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। আনুমানিক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস বারভুঞা মধ্যে কন্দর্পনারায়ন ভুপাল দাশ ভুঞা সবং থানার কোলান্দা গ্রামে কেলেঘাই নদীর উত্তরে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জিউর জন্য সেই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এবং তারই আমলে গোকুলাননন্দ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে ভান্ডারী হিসাবে নিযুক্ত হয়। পরবর্ত্তি কালে ঐ গোকুলানন্দ বাবাজী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করে যার জন্ম ভিটা ছিল অধুনা পটাশপুর থানার গোকুলপুর মৌজায়। তিনি ধীরে ধীরে বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে উচ্চমার্গে নিয়ে যান ও নিজেকে এক বাকসিদ্ধ পুরুষ হিসাবে সমাজে প্রতিপন্ন হন। তিনি নির্জনে কেলেঘাই নদীর এই উচু ঢিপিতে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে এখানে থেকেই তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন লাভ করে। লোকমুখে আজো শোনা যায় তাঁর অলৌকিক কর্ম কান্ডের কথা। পরবর্তীকালে ভুপাল দাসের প্রপৌত্র বিপ্রপ্রসাদ দাশ গোকুলানন্দ মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও প্রধান শিষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। জীবদস্যায় গকুলানন্দ বাবাজীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ তাঁর সানিধ্য লাভের আশায় ছুঁটে আসতেন এই উচু ঢিপিতে তাঁর আশ্রয়স্থলে তুলসী মঞ্চের কাছে।

মৃত্যুর পর গুরুদেবের ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে তাঁর স্মৃতি রক্ষ্যায় এই তুলসী মঞ্চকে কেন্দ্র করে শুরু হয় একদিনের মেলা বা যাত। মেলার পত্তন করেন বিপ্রপ্রসাদ ভুঞা -তাই এক সময় একে ভুঞার যাত বলা হত। যাইহোক গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার আকর্ষণে বছরের পর বছর পুন্যার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে বাড়তে থাকে দোকানপাতি।

তদানিন্তন কালে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রধান মাধ্যম ছিল নদী ও নৌকা। পাল তোলা নৌকা ব্যবহার করে নৌপথে কেলেঘাই নদী দিয়ে নানান সামগ্রি নিয়ে আসতেন দোকানদারেরা। ওড়িশা, বাংলাদেশ, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান থেকে দোকাদারেরা বিক্রয় সামগ্রি গরুর গাড়ি ও কেলেঘাই নদী পথে জড়ো করতেন এই নদীর চরে। পৌষ সংক্রান্তির রাতে কনকনে ঠান্ডায় হাজার হাজার পুন্যার্থী নদীতে ডুব দিয়ে মাটি তুলে তুলসী মঞ্চে নিবেদন করতেন গোকুলানন্দ বাবাজীর জয় গানে। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত এই মেলা ছিল একদিনের।

পরবর্তীকালে জমিদারি হস্তান্তর ও জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির ফলে মেলার মালিকানা দুই পক্ষে বিভক্ত হয়, এক অংশ পটাশপুর থানা ও বাকি অংশ সবং থানার ব্যাক্তি বর্গের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মেলার ঐতিহ্য খানিক মলিন হতে শুরু করে এবং মেলায় অসামাজিক কাজ কর্ম বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খাজুরি গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপালচন্দ্র দাশ অধিকারী মহাশয় এবং কিছু সুহৃদয় ব্যাক্তি বর্গের উৎসাহে ও উদ্যোগে এই মেলার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ইতিহাস হল যে এই মেলা থেকে ৬৩ টাকা ভিক্ষা করে ১৯৪০ সালের ১৮ ই জানুয়ারি দসগ্রাম সতীশচন্দ্র ইউনিয়ন হাইস্কুল বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় মেলার কৌলীন্যতা ও অসামাজিক রীতিনীতিকে পরিমার্জন করে মেলার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ মেলার পরিসর একদিন থেকে সাতদিন করা হয়। এই পরিসর বাড়ানোর ক্ষেত্রে তৎকালীন কোলন্দা, খাজুরি গ্রামের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র বিশেষ ভুমিকা পালন করেছিলেন। কারণ বর্তমান যেখানে এই মেলা সেই সময় সেইখানে গভীর বন জঙ্গলে ভরা ছিল এবং বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল ছিল। যারফলে দোকানদারগন রাত্রিতে এই যায়গায় থাকতে ভীষণ ভয় করতেন সেই সঙ্গে চুরি ও ডাকাতির ভয়ও ছিল।

বিবর্তনের ধারায় মেলার ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে ধীরে ধীরে জুড়ে যায় সামাজিক নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কেনা বেচায়। এই মেলা হয়ে ওঠে গ্রমীণ জনজীবনের প্রধান ক্রয়বিক্রয় ক্ষেত্র। তাই মাটির হাড়ি থেকে শুরু করে সোনার গহনা পর্যন্ত যাবতীয় সাংসারিক জিনিস পত্র এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্রঃ

১) তুলসিচারার মেলার ইতিহাস।

খোলা চিঠি - শুধু তোমাকে 'কেলেঘাই'

বিষ্ণুপদ দাশ
পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

বিনা ভাষ্যে ছক ভেঙে আজ তোমার মুখোমুখি। জানি 'কাটা ছাঁটা সোজা কথা'ও ইঙ্গিত ইশারার দোসর। সুখ-দুঃখের সালতামামিতে মোড়া আলোছায়ার ভাঙা আয়নায় বিচ্ছুরিত জলছবি। যে ছবিতে রঙ মেলানোর আবির খুঁজে ফিরি। এঁকে দিই জলের তিলক। শুরু হোক স্তোত্রপাঠ-

''সতত, হে নদ! তুমি পড় মোর মনে''

এ বন্দনা গান- একাধারে প্রেম ও পূজা। বিদেশ বিভুঁয়ে বারবার মনে পড়েছে নৃত্য চপলা ছন্দিত তনু-মনে বয়ে চলা এক নদীর নাম। কপোতের অক্ষির মত স্বচ্ছতোয়া সে নদী- নারীর পেলব আশ্রয় খুঁজে বেড়ানো এক কাঙাল হৃদয় এসে দাঁড়ায়। এই পথ- এই নদী তার প্রেমাস্পদ। 'জীবনের সব লেনদেন' চুকিয়ে 'পাখির নীড়ের মতো ' চোখের সন্ধানে তোমার কাছে যাওয়া। কেননা এখনো 'নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল'। যাযাবর জীবনে 'গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভল্গার রূপ' দেখে ক্লান্ত পথিক চলার আনন্দে ছুটে চলে লোকোত্তরে। রূপানুরাগে মত্ত হয়ে আন্তরিক রতির দরদে সে বলে যায়-

''লাল সে গালের কালো তিলটির বদলে গো
দিয়ে দিতে পারি সমরখন্দ ও বোখারারা''

এইভাবে নিঃস্ব হতে চায় প্রেমিক হৃদয়- ।

জীবনের ছদ্ম আবরণ খুলে তুমি যখন দেহখানি তুলে ধরো আমার দেবালয়ে প্রদীপ হয়ে, তখন মনে হয় প্রেম আর পূজা যেন সমার্থক। তখন দেখি-

''কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ দেয় প্রিয়ার গলায়''

এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। চমকে উঠি চিরন্তন সেই প্রশ্ন শুনে-

''এতদিন কোথায় ছিলেন ?

শোনো, সমভ্রম দূরত্বের কুহেলিকা সরিয়ে বরং বলা ভালো-

''এতদিন কোথায় ছিলে ?
পথ ভুলে তুমি কি এলে ?''

এ ভাষা বোঝে না কেউ। হৃদয় সংরাগে মোড়া, গভীর আশ্লেষে শুধু এ জীবন ধন্য হতে চায়। নীড় গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা ভাষার মতো কোন এক বোধের অগম তীরে নীরব প্রতীক্ষা।-

''ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহি''-

প্রেমের ইদগাহে ঈক্ষণ জাগানো ভাষার পাঠোদ্ধারে আজকের চ্যাটজিপিটিও গোলক ধাঁধায় ঘুরতে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে আসবেনা কখনো। তোমাকে বাঁধার সাধ্য কার ? মুক্তধারা গতিপথে কলকল্লোলে বয়ে যাওয়া অপাপবিদ্ধ। কে দেখে মনে বলে

ওঠে-

"ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা"

জানি 'সময় গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার।' আজ পৌঢ় প্রহরে শ্রীহীন বর্তমান কারাবাসে নদী তীরে ফাগুন-পলাশের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘদূত রচনার সাধ জাগে। মধু বসন্তে আজ সে দূরদ্বীপবাসিনী। দারুচিনি দ্বীপের ভিতর বসে থাকা তার কাছে-

"জল চাই একটু যদি
দুহাত ভরে শুকনো বালু দেয় আমারে"।

তখন ভাবি, এ প্রিয়া কেমন প্রিয়া ? এ নদী কেমন নদী ?

"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ" ?- এই দার্শনিক প্রশ্নে আমার কাজ নেই। সাকিন ঠিকানার তত্ত্বতালাশ করে বোহেমিয়ান হয়ে হাল ভাঙা পালছিঁড়া নাবিকের মত করুণার পাত্র হতে চাই না। বরং বলা ভালো- "তোমার অভিসারে যাব অগম পারে"। উত্তাল তরঙ্গপথে একাকী ?

প্রেমিক মন শুধু বলে-

"হ কপিলা চলুক সঙ্গে"।

সত্য শুধু কামনা। মরণ পিপাশা মিথ্যার একশেষ। তবু রোমান্টিক মন আশাবাদী,-

"পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছো, আমি আছি"।

জন্মান্তর মানি বা না মানি তবু মনে হয়-

মোরা আর জনমের হংস মিথুন ছিলাম।
ঝিলম নদীর চরে।"

ঝিলম নদী দেখা হয়নি, দেখা হয়নি শিকারাও। সন্ধ্যারাগে ঝিলমের স্রোত খাপে ঢাকা বাঁকা তললোয়ার হয়ে যায় নিবিড় ভাবনায়। পড়ন্ত বিকেলে নদী জলে সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ রচনা করে। ধানসিঁড়ি নদী তীরের আকর্ষনেইতো বরাবর পৃথবীতে ফিরে আসা। মনুষ্যেতর প্রাণি হয়েও শুনেছি মিশরীয় সভ্যতায় নীলনদ জয়া ও জননী। ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রিস যেন যীশুখ্রীষ্টের দুটি চোখ। সেই ধারায়-

"গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
দুই চোখে দুই জলের ধারা, মেঘনা যমুনা"।

জনিতার ঋণ ভুলি কি করে ? সে যে নদী মাতৃকা।

এতক্ষন হলো গৌরচন্দ্রিকা,- 'সুরধনী তীরে উজোর'। এবার বলি- "এ চিঠি পাবে কিনা জানিনা"। শুধু জানি চিঠি অভিসারিকা। সে অবগুন্ঠিতা। চুম্বনের মতো পবিত্র। গ্রামের ইস্কুলে শেখা- 'আমাদের ছোট নদী' পেরিয়ে তোমাকে চেনা। জল গড়াল অনেক দূর। তখন পূর্বরাগের সূচনা পর্ব। 'একটি নদীর আত্মকথা' রচনায় উপমা সজ্জিত মানসী প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'সখ্যতা' শব্দের পরিবর্তে 'সখ্য' লেখার নিদান দিলেন

বাংলা শিক্ষক; ব্যাকরনের দোহাই দিয়ে। মনে হল প্রেমের আবার ব্যাকরণ আছে নাকি ? ভালোবাসসায় অনাবশ্যক 'অ-কার' কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ করবে ? মনে মনে ভাবলাম-

''সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে
আমি যদি এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই ?''

সে কথার মেলেনি উত্তর।

এরপর রাগ অনুরাগে তোমার কাছে যাওয়া। আপন বেগে পাগল পারার তীরে বসে-

''দেখেছি সবুজ পাতা
অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ''

মরা নদীর সোঁতার ধারে সেদিন প্রথম হিজল চিনেছিলাম। যৌবনের আলো আঁধারিতে দেখেছিলাম সে গাছের জানালায় আলো আর বুলবুলির খেলা। অতীতচারী মনের ক্যানভাসে ধরাদিত কালিন্দী যমুনার অবিরত বংশীর ধ্বনি -

''তুমি কি যমুনার তীরে কদম্বের
শাখে বসি বাজাতে বাঁশরী!''

অঞ্জলি ভরে গাইতাম-

''ওরে নীল যমুনার জল''

খুঁজে পেয়েছি প্রার্থনা গানের মতো জীবন ধন্য করা সে প্রেম কে। আবার বিতত যন্ত্রনায় তোমার কাছে গিয়ে বলেছি-

''বন্ধু, সকলই আমারই দোষ''।

এখন ভাবি সোজা পথে গেলে তোমার সঙ্গে যেতাম-'আমি জীবন ভর'।

অদ্ভুত আঁধারে আজ অবরে সবরেএ প্রশ্ন করি- 'তুমি বইছো কেন' ? নিরুত্তর তোমাকে দেখে মনে হয়-

''একদিকে আমি শত সহস্র আর্তনাদ
অন্যদিকে তুমি এক পরমাশ্চর্য না শোনার''

মনের দহনে কেয়াপাতার নৌকা নয়, তোমার জলে ভাসিয়েছি বিসর্জিত প্রেম প্রতিমাকে- যাকে গড়ে তুলেছিলাম ''আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে।''

তোমার চিঠিতো কম পাইনি।সে চিঠির ভাষা 'আবঙমনসগোচর।' মনের ট্রাম্পেটে দেখি- 'বাবুই পাখির বাসা', শামুক খোলের মেলা, গাঙশালিখের ব্যস্ততা, বিজন বনে কুররীর ব্যস্ত মধুর চলা, বেহুলার খেয়া, সাঁকো পারাপারের মায়াময় ছায়াঘেরা গোকুলানন্দের সমাধি যেন মিশরীয় পিরামিডের হাতছানি। তাল-তমাল, বাবলা, অর্জুন আর হিজলের থেকে স্বর্ণ শিখরে লুকোচুরি খেলা শেষে বিকেলে রোদের গন্ধ মাখা সে চিঠি এসেছিল লেফাফায় ভরে প্রেমপারাবত হয়ে-

''মনে পড়ে বসন্তের শেষে আসা
ম্লান মৌন আগমনী সেই নিশি।
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হল

তব আঁখি চাওয়া সনে মিশি''।

আবার বিরহের তীব্র দহনে তোমার কাছে অকপটে বলা যায়- জৈবিক এষণা; হোক না যতই নিষ্ঠুর কথন-

''প্রেম সত্য, প্রেমপাত্র বহু অগনন
প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম
সে সরাব লহু''।

পেলব হৃদয় ছেনে চুমে মনে হয় প্রেম শুধু কাছে টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। তাই কোটি মন্বন্তরেও তাকে ভোলা যায় না। সে এক আগুন, যা লাগালেও লাগে না, নেভালেও নেভে না।

''নাইবা পেলাম আমার গলায়
তোমার গলার হার
তোমায় আমি করব সৃজন
এ মোর অহংকার''

চিঠিতো গোপন কথা বয়ে নিয়ে যায়। অনাবৃত মন তাই শম্বুক গতি নিয়ে ফিরে যায় মনের ডেরায়।অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মত প্রেমাস্পদের কাছে মন হারাতে চায়। ফুরায় না তার কিছুই ফুরায় না। এ নদী হয়ে যায় 'ভবনই;' ভব-নদী। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে এসো শুচিস্নাত হই। সমাসোক্তিতে কত কথাই বলে গেলাম মৃন্ময়ের তাড়ায়। সেও তো এক নদীপ্রেমিক। মৃন্ময় তোমাকে বলি-

''সে যে ফিরে ফিরে আসে
বছরের সেই মাসে;
দেখো নিকি সেই শোভা
সেই রূপ সেই রঙ ?''

যাব্বাবা! তার নামটাই নিতে ভুলে গেছি। নাম শ্রবণেও যে পূর্বরাগের মতো আবহমান অশ্রুত ধবনি বাজে, স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ জুড়ে-

'কেলেঘাই'- শুধু স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল''

পুনশ্চ- আর একটি কথা তোমায় বলি, জন্মদিনের উপহারে পড়ো আমার অবিনাশী প্রেমের স্বপ্ন আখর-

''তিমির বিনাশি হবার কলিজা আছে কি জানি না, তবু তমসায়
জাগবো দু'জনে সবকিছু ভুলে, চৈতালী রাতে স্বপ্নের ঋণে
বিষন্ন ভাঙা চাঁদের আলোয় আরও একবার ভালোবাসা যায়
মৃত্যুর মুখে থুৎকার দিতে, প্রেয়সী,-তোমার জন্মদিনে''।

::::::::::::::::::



একটি নদী - একটি সভ্যতার হৃদপিণ্ড। মানুষের হৃৎপিণ্ডে ব্লক, যেমন মানুষের সারা শরীরের রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়, ঠিক তেমনি নদী যদি জনজীবনের হৃৎপিণ্ড হয় তবে নদীর প্রবাহ পথে কৃত্রিম সাঁকোগুলো এক একটি ব্লক।

বর্তমানে আমাদের নদী কেলেঘাই নানান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু খেয়াল করলে বোঝা যায় একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কেলেঘাই নদীতে এই ধরণের সমস্যা ছিল না। তার একটাই কারণ নদীর প্রবাহ ছিল অবাধ ও মসৃণ।

কেলেঘাই নদীর উপর কৃত্রিম সাঁকোগুলোর পরিবর্তে বিকল্প পরিবহন মাধ্যম না হলে, বিপদ আসবেই।